হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ এর অভ্যুদয়ের ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধু

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল দিয়ে বছর শুরু হলো। নীলান্ত এবার ৭ম শ্রেণিতে। বাংলা অঞ্চলে মানুষজন গোত্রবদ্ধ জীবন থেকে কীভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল সেই ইতিহাসে মগ্ন হয়ে আছে সে। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে খুশি আপা ইতিহাসের এই বিষয়গুলো খুব সহজভাবে পড়িয়েছিলেন। নীলান্ত-র মনে তারপরেও নানান চিন্তা ও প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে সে এই ভেবে আনন্দিত যে, ৭ম শ্রেণিতে খুশি আপার কাছ থেকে তার চিন্তা ও প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবে এবং এই ইতিহাসের আরো কিছু নতুন তথ্য বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে। খুশি আপা ক্লাসে এলেন। হাসিমুখে সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালেন। তাঁর হাতে নতুন বছরের নতুন বই – ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান। তিনি সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ইতিহাস বিষয়ে কী পড়েছিলে মনে আছে? নীলান্ত দাঁড়িয়ে উত্তর দিলো, বাংলার ভৌগোলিক অঞ্চলে একদল মানুষের বহুবিচিত্র প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, গোত্রবদ্ধ জীবন থেকে সমাজ-রাজনীতি গঠন ও সেই ভূখণ্ডের পূর্ব অংশে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অভিজ্ঞতার কিছু ইতিহাস আপনি পড়িয়েছিলেন। ৭ম শ্রেণিতে এই ইতিহাসের আরো বিস্তারিত তোমরা জানতে পারবে, বললেন খুশি আপা।

কাল পরম্পরায় বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সংগ্রাম

তোমরা হয়তো খেয়াল করে থাকবে, বাংলা অঞ্চলে প্রাচীন মানুষের খাদ্য সংগ্রহ ও শিকারের কথা বলতে গিয়ে সহজলভ্যতার কথা আমরা অনেকবার বলেছি। এখানকার ভূমি ছিল উর্বর, তাই ফলমূলের আধিক্য ছিল বরাবরই। বন-জঙ্গলে আরো ছিল খাবার উপযোগী প্রচুর সামগ্রী আর নদীগুলো ছিল মৎস্য সম্পদে পরিপূর্ণ। বাংলা অঞ্চলের মানুষের দেহ-গড়ন, ভাষা ও সংস্কৃতিতে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তার কারণ হচ্ছে আদি কাল থেকেই বহুবিচিত্র জনধারা এবং ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ এখানে এসেছে এবং খাদ্যের প্রাচুর্য দেখে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে জয় করে প্রাকৃতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছে। সহজলভ্য খাদ্য ও অন্যান্য সম্পদের লোভেই যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন রাজবংশ, সৈনিক ও যোদ্ধারা বাংলা অঞ্চল আক্রমণ করেছে। কখনও তারা লুটপাট করে চলে গিয়েছে, কখনও আবার স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে নিজেদের ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। এই দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে তাই খাদ্যের প্রাচুর্য যেমন ছিল, তেমনই নানা রকম প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিকূলতাও ছিল।

বাংলা অঞ্চলের ভূমি বরাবরই বিরল বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময়। এই অঞ্চলের উত্তরে হিমালয় পর্বত, পূর্ব ও পশ্চিমের অন্যান্য পার্বত্য এলাকা থেকে নেমে আসা নদীগুলো বাংলায় প্রবেশ করে অসংখ্য শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়েছে। সমস্ত অঞ্চলটিকে জালের মতো জটাকারে আবদ্ধ করেছে। বন- জঙ্গল এবং নদীতে যেমন রয়েছে সহজ খাদ্যের জোগান, তেমনই রয়েছে সাপ, কুমির, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জীব জন্তু এবং বিষাক্ত কীট-পতংগের প্রকোপ। ঝড়-তুফান আর বন্যা এ অঞ্চলের মানুষের নিত্যসঙ্গী। উঁচু-নিচু জলাভূমি সমতল করে, বন-জঙ্গল পরিষ্কার করেই তাদের তৈরি করতে হয়েছে নিজেদের বাসভূমি এবং চাষক্ষেত্র। এখানে খাদ্যের জোগান সহজ হলেও মানুষের জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি তুরস্ক,

পারস্য, আফগানিস্তান, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত, ইউরোপসহ নানা স্থান থেকে আসা যোদ্ধা এবং রাজাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধেও কখনও লড়াই করে, কখনও আপোষ-মীমাংসা করে বাংলা অঞ্চলের মানুষকে টিকে থাকতে হয়েছে।

খুশি আপা বাংলা অঞ্চলে প্রাচীনকালের মানুষের জীবন-সংগ্রামের উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ৬ষ্ঠ শ্রেণির অনুসন্ধানী বইয়ে তোমরা ইতিহাসের অনেক বিস্তারিত তথ্য পড়েছ। বাংলা অঞ্চলে প্রাচীনকালের মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতির অভিজ্ঞতা জেনেছ। ৭ম শ্রেণির অনুসন্ধানী বইয়েও তোমরা দক্ষিণ এশিয়ায় কীভাবে মানুষ সভ্যতা নির্মাণে এগিয়েছে তার অনেক তথ্য পাবে। দক্ষিণ এশিয়ার পূর্ব অংশ যেখানে বাংলা অঞ্চল অবস্থিত, সেখানকার মানুষের জীবন-সংগ্রাম এবং সভ্যতা বিনির্মাণের দ্বন্দ্বমুখর ইতিহাস জানাটা আমাদের জন্যে নিশ্চয়ই আনন্দের হবে। কেননা এই বাংলা অঞ্চলের পূর্ব অংশেই প্রাচীন 'বঙ্গ' জনপদ থেকে ধীরে ধীরে 'বঙ্গাল', তারপর 'বাঙ্গালা' এবং ১৮ শতক থেকে 'বেঙ্গল' নামে পরিচিতি গড়ে ওঠে। তোমরা বড় হয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবে যে, এই 'বেঙ্গল' বা 'বাংলা' পরবর্তীকালে কীভাবে 'পূর্ব বাংলা' আর 'পশ্চিম বাংলা' নামে বিভক্ত হয় এবং পূর্ব অংশে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হয়।

বাংলা অঞ্চলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসে বাংলা অঞ্চলের মানুষের সংযোগ আর অভিজ্ঞতার কথা জানতে ক্লাসের সবার মতোই নীলান্ত উদগ্রীব হয়ে আছে। খুশি আপার কাছে নীলান্ত জানতে চাইল, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে হরপ্পা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে আমাদের অনুসন্ধানী বইয়ে ছবিসহ দেখেছি। বাংলা অঞ্চলে কি এমন কোনো সভ্যতার কথা জানা যায়? খুশি আপা জানালেন, দক্ষিণ এশিয়ায় সভ্যতা নির্মাণের পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতার মতোই বাংলা অঞ্চলের মানুষজনও নিজেদের মতো করে সভ্যতা নির্মাণ করেছিল। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা পান্ডু রাজার ঢিবির কথা পড়েছ। এছাড়া পুণ্ড্রনগর, তাম্রলিপ্তি, সমতটসহ অনেকগুলো স্থানে নগর-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে দেব, চন্দ্র, পাল এবং সেন রাজবংশ বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময় রাজত্ব করতে শুরু করে। উত্তর ভারতে এই সময় বেশ কয়েকটি শক্তিশালী রাজবংশ তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। যাদের মধ্যে রয়েছে মৌর্য্য, কুষাণ, গুপ্তসহ নানা রাজবংশ। এসব রাজবংশের উচ্চাভিলাষী রাজাদের কর্মকাণ্ড তোমরা অনুসন্ধানী বইয়ে দেখতে পাবে। উত্তর ভারতের ক্ষমতাকেন্দ্রিক এই রাজনীতি ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই সকল তথাকথিত অভিজাত রাজক্ষমতাশালীরা পূর্বদিকে তাদের ক্ষমতা বিস্তার করতে গিয়ে বাংলা অঞ্চলেও বারবার আক্রমণ পরিচালনা করেছে, দখল করেছে। এই রাজবংশের রাজাদের ধর্ম, ভাষা যাই হোক না কেনো তারা ছিলেন ক্ষমতালোভী আর উচ্চাভিলাষী। নিজেদের নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তার করাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচীনকালের যুগধর্ম অনুযায়ী হিন্দু, বৌদ্ধ রাজাদের মতো মধ্যযুগেও মুসলিম রাজারা একই প্রক্রিয়ায় যুদ্ধ, দখলদারিত্ব চালিয়েছেন। প্রাচীন যুগের মতো মধ্যযুগের রাজারাও ভারত ও বাংলা অঞ্চল দখলে নিয়ে সুলতানি ও মুঘল নামে শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় বণিকদের হাত ধরে এই অঞ্চলে একই প্রক্রিয়ায় দখলদারিত্ব অব্যাহত রেখেছে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজসহ স্বার্থ ও সুবিধাবাদী নানা জাতি। তাদের ক্ষমতা বিস্তার আর সম্পদ দখলের রাস্তা ধরে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের মানুষের ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ শুরু হয় ১৯৪৭ সাল থেকে। এই সকল শাসন-শোষণের অবসান হয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

অনুসন্ধানী বই দেখে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারত ও বাংলা শাসনকারী রাজবংশের পৃথক পৃথক দুটি তালিকা তৈরি করো।

বাংলা অঞ্চলে ক্ষমতার পালাবদল

খুশি আপা খুব সহজভাবে বলতে শুরু করলেন, সাধারণ অব্দ ১৩ শতক পর্যন্ত সময়ের পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলের অধিবাসীরা গোত্রজীবন থেকে রাষ্ট্র গঠনের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল সেখানে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় ১৩ শতকের পর থেকে। ১২ শতক এবং ১৩ শতকের সূচনালগ্ন পর্যন্ত বাংলা অঞ্চল শাসন করছিল দক্ষিণ ভারত থেকে আগত উচ্চাভিলাষী ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজবংশ। নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তারে ব্যতিব্যস্ত এই বংশের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ রাজা বিজয়সেন বৃহৎ পরিসরে বেশ কিছু যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। সেন বংশের পরবর্তী রাজাদের মধ্যে বল্লালসেন এবং লক্ষণসেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রবর্তন এবং সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সমাজে এই ঘটনা বহুবিচিত্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনাকারী শক্তি হিসেবে পাল ও সেন রাজাদের মতোই পরবর্তী সময় বাংলা অঞ্চলের রাজক্ষমতা অল্প কিছু মানুষের হাতে পরিচালিত হয়। কতিপয় অভিজাত এবং ভাগ্যান্বেষী মুসলমান সৈনিক ও যোদ্ধার আগ্রাসন ১৩ শতক থেকে উত্তর ভারতের মতোই বাংলা অঞ্চলেও শুরু হয়। বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবনে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয় নতুন কয়েকটি রাজশক্তি, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি। সুদূর তুরস্ক থেকে আগত ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে আঞ্চলিক বাংলার উত্তর এবং পশ্চিম সীমানার বেশ কিছু অংশ দখল করে নেন। এই দখলের প্রক্রিয়ায় তিনি বেশ কিছু বিহার এবং পাঠাগার ধ্বংস করেন। বখতিয়ার খলজীর হাত ধরেই বাংলা অঞ্চলে মুসলমানদের শাসন শুরু হয়। এরপর আলী মর্দান খলজী, শিরান খলজী, ইওজ খলজী প্রমুখ বাংলার বেশ কিছু অংশে রাজত্ব শুরু করেন। তারা নির্মাণ করতে শুরু করেন মসজিদ-মাদ্রাসা। বাংলা অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী আদি অধিবাসীদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির সংগে মুসলমানদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির কোনো মিল ছিল না। কিন্তু ইসলামের সাম্য, মানবতা ও উদারতার গুণ বাংলার সাধারণ মানুষকে বেশ আকর্ষণ করেছিল।

মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রায় সমগ্র অঞ্চল দখল করে নিলে দিল্লির ইতিহাসবিদ শামস-ই-সিরাজ আফিফ তাঁকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' উপাধি প্রদান করেন। ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ, গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ, রাজা গণেশ, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, নসরত শাহের মতো রাজা/সুলতান বাংলার রাজক্ষমতায় আসীন হন। ভারতবর্ষ তথা বাংলা অঞ্চলে বহু দূরের ভূখণ্ড থেকে আগত এসব শক্তির বিরুদ্ধে সমবেতভাবে লড়াই করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের ছিল না। তারা ছিল শান্তিপ্রিয়। ইসলামও শান্তি এবং সকল মানুষের সহাবস্থানের বাণী প্রচার করে। সাধারণ মানুষের সংগে তাই মুসলমান শাসকদের খুব একটা দূরত্ব ছিল না। কিন্তু দূরত্ব আর দ্বন্দ্ব ছিল দিল্লির মুসলমান সুলতান এবং রাজাদের সংগে বাংলার মুসলমান সুলতান এবং রাজাদের। দিল্লির সুলতান প্রায়শই বাংলার সুলতান বা কোনো একজন শাসককে দমন বা অধীনস্থ করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। বাংলার রাজক্ষমতা দখলে নিয়ে দিল্লির সুলতান যাকে অনুগত মনে করে দায়িত্ব দিতেন, দেখা যেত অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি দিল্লির সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। বাংলা অঞ্চলকে অনেক ইতিহাসবিদ সেই সময় 'বলগাখপুর' বা 'বিদ্রোহের নগরী' বলেও বিভিন্ন লেখনীতে উল্লেখ করেন। যাই হোক, দিল্লির মুসলমান শাসকদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাংলা অঞ্চলের মুসলমান শাসকগণ প্রায় ২০০ বছরের 'স্বাধীন সুলতানদের আমল' প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন বলে ইতিহাসবিদ সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন। কিন্তু বাংলা অঞ্চলের সম্পূর্ণ অংশে এই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল তা বলা যাবে না। বিভিন্ন সময় বাংলার বিভিন্ন অংশে মুসলমানদের ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। তাই ইতিহাসবিদগণের অনেকেই ১৩ থেকে ১৬ শতক এবং ১৬ থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত সময়কে "সুলতানি আমল", "মুঘল আমল" বা "মুসলিম শাসন আমল" বলে যেভাবে চিহ্নিত করে থাকেন, বাংলা অঞ্চলের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় বলেই আধুনিক গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে।

বাংলা অঞ্চল দখলে নিয়ে মুসলমানদের শাসন শুরু হলেও এখানকার প্রজারা ছিল প্রায় সবাই হিন্দু, বৌদ্ধ, শৈব এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনায় যুক্ত লোকধর্মের অনুসারী। এ সময় বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে পীর সুফি দরবেশরা বসতি স্থাপন করে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নিজেদের ধর্ম প্রচারের চেষ্টায় নিয়োজিত হন। পীর, সুফি, দরবেশ বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় খানকাহ স্থাপন করে অপেক্ষাকৃত প্রান্তিক বা ব্রাহ্মণ্য-সমাজ কাঠামোতে পিছিয়ে থাকা সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচারের প্রয়াস চালান। ধীরে ধীরে ইসলামের উদার, মানবিক এবং সহিষ্ণুতার নীতি বাংলা অঞ্চলের মানুষদের আকৃষ্ট করতে থাকে। বাংলা অঞ্চলে ইসলামের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষও ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। প্রথম দিকে এই প্রক্রিয়া ছিল ধীরগতিসম্পন্ন। আস্তে আস্তে বিপুলসংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ১৮৭২ সালে ভারতে পরিচালিত প্রথম আদমশুমারিতে দেখা যায়, ভারতবর্ষের পূর্বাংশে অর্থাৎ বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বেশি। আবার বাংলা অঞ্চলের পশ্চিম অংশের তুলনায় পূর্ব অংশে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ছিল মুসলমান। বাংলায় মুসলমান শাসকদের অবদানের তুলনায় ইসলাম ধর্ম প্রচারক অর্থাৎ পীর, সুফি, দরবেশগণের কর্মকাণ্ড ইসলাম প্রচারে অনেক বেশি কার্যকর হয়েছে বলে গবেষণায় দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০ শতকে নানা ধরনের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে মুসলমানদের সংখ্যা আগের চেয়েও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়।

মুঘল শক্তির অধীনে বাংলা

অনুসন্ধানী বইয়ের শেষ অধ্যায়ে 'সুলতানি আমল ও বাংলা' সম্পর্কে আরো আলোচনা রয়েছে জানিয়ে খুশি আপা আবার বলা শুরু করলেন, ১৬ শতক থেকে বাংলায় মুঘল শাসকদের আগ্রাসন শুরু হয়। মুঘলদের বিরুদ্ধে বাংলার ছোট ছোট ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ কখন ঐক্যবদ্ধ আবার কখন বা এককভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এসব প্রতিরোধ 'বারো ভূঁইয়া'দের প্রতিরোধ নামে ইতিহাসে খ্যাত। ঈসা খান এবং মুসা খান ছিলেন বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। মুঘলদের সাথে বারো ভূঁইয়াদের যে লড়াই সেখানেও কিন্তু বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের তেমন কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। এসবই ছিল নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তারে ব্যতিব্যস্ত অভিজাত ক্ষমতাবান শ্রেণির নিজেদের লড়াই। ধর্ম বা ভাষা এক হলেও তারা এই লড়াই চালাতেন। সম্পদ এবং জমির মালিকানা দখলে নেওয়াই ছিল তাদের কাছে মুখ্য। জল ও জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত ভূমি দান করার মাধ্যমে আবাদযোগ্য করা এবং সেখান থেকে খাজনা আদায় করাই ছিল বাংলা অঞ্চলে মুঘল শাসকদের রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ। প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা ও শস্য আদায় করে মুঘল শাসকরা বিলাসী জীবন যাপন করতেন। তাদের এই তৎপরতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল স্থানীয় ক্ষমতাবান জমিদার বা বারো ভূঁইয়ারা। এই দুই পক্ষের লড়াই ছিল কারো জন্যে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা আর কারো জন্যে ক্ষমতা দখলে নেওয়ার প্রয়াস। বলা যায়, এই লড়াই ছিল মূলত সাধারণ মানুষের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অধিকার নিয়ে চলমান দুটি অভিজাত পক্ষের যুদ্ধ। খুশি আপা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে গোটা ভারতে মুঘল এবং আফগান মুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের যে লড়াই চলমান ছিল,

১৫৭৬ সালে বাংলার সীমান্তে পরিচালিত রাজমহলের যুদ্ধ তারই অংশ। এই যুদ্ধের পরপরই বাংলা অঞ্চল মুঘলদের অধীনস্থ হয়। বাংলার নাম দেওয়া হয় 'সুবাহ বাংলা'। এ-সম্পর্কে বড় হয়ে তোমরা আরো বিস্তারিত জানতে পারবে।

ব্রিটিশ শাসনে বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ

খুশি আপা এবার শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে খুব সহজভাবে বাংলা অঞ্চলে ইংরেজদের আগমন এবং শোষণের ইতিহাস তুলে ধরতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রথমবার ব্যাপকভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে শুরু করেছিল মূলত ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা হবার পর। কেননা এই সময় কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রামের প্রত্যন্ত অংশে প্রবেশ করেছিল। বহু দূরের ভূ-খণ্ড থেকে আগত ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী গরিব কৃষকদের জোর করে ভূমিতে নীলসহ অন্যান্য কৃষি দ্রব্যাদি চাষে বাধ্য করত এবং একই সাথে তাদের ওপর প্রয়োগ করত নানা ধরনের পীড়নমূলক নীতি। এর ফলে দেখা দেয় নানা ধরনের বিদ্রোহ। নীল বিদ্রোহের পাশাপাশি টঙ্ক, নানকার, স্বদেশি, সাঁওতাল বিদ্রোহ, অসহযোগ আন্দোলনসহ নানা ধরনের আন্দোলন ক্রমেই দানা বেঁধে ওঠে। আর এসব আন্দোলনে সাধারণ মানুষ ও কৃষককুল ব্যাপকভাবে অংশ নিতে শুরু করে। বাংলা অঞ্চলের মেয়েরাও বিপ্লব এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেয়। ইংরেজ শাসকদের বিতাড়িত করার আন্দোলনে যোগ দিয়ে শহীদ হন বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। এছাড়া বিপ্লবী ইলামিত্রসহ অনেকেই নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হন। বাংলা অঞ্চলের মতো গোটা ভারতবর্ষেই এই ধরনের আন্দোলন চলতে থাকে। সাধারণ সহযোজি মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মুখে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

যুক্তিবাদী সমাজ ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পথে বাংলা

১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছরের ইংরেজ শাসনামলে ভারত তথা বাংলা অঞ্চলের মানুষজন পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংগে পরিচিত হয়। এর বহুবিচিত্র প্রভাব পড়েছিল এতদঞ্চলের ইতিহাসে। বাংলা অঞ্চলসহ ভারতীয় উপমহাদেশে সংস্কারমুক্ত একদল মানুষের উত্থান ঘটে, যারা হাজার বছর ধরে চলমান ধর্ম-সামাজিক গোঁড়ামিকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির পথ তৈরিতে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। এই তালিকায় রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা বিলুপ্ত করা, পর্দা বা অবরোধ প্রথার শৃঙ্খল থেকে নারীদের মুক্ত করে শিক্ষার আলোতে নিয়ে আসার জন্যে তারা আমৃত্যু সংস্কার আন্দোলন এবং লেখালেখি করেছেন। ইংরেজ সরকারের গভর্নরদের মধ্যেও অনেকেই ছিলেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তি, বাল্যবিয়ে বন্ধ এবং বিধবা বিয়ে চালু করার মতো জরুরি বিষয় আইন করে এখানে বাস্তবায়নের প্রয়াস চালানো হয় সেই সময়ে। গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্যে ইউরোপ থেকে আগত অনেকেই তখন কখনও শিক্ষকতায় যুক্ত থেকে, সংগঠন করে, কখনও আবার পত্রিকায় লেখালেখি করে সক্রিয় তৎপরতা চালিয়েছেন। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন এমনই একজন ইউরোপীয় কবি, যুক্তিবাদী চিন্তক ও দার্শনিক। কলকাতার হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্য এবং ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন ডিরোজিও। কিন্তু তাঁর শিক্ষাদান শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন সংগঠন করে, পত্রিকা খুলে তিনি দর্শন ও যুক্তির শিক্ষা প্রসারে মনোযোগী হয়েছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলোতে বিদ্যমান গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও অন্ধত্বের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর শিক্ষার্থী ও অনুসারীদের সচেতন করে তোলেন। এর ফলে গোঁড়া ধার্মিক ও মৌলবাদীদের শত্রুতে পরিণত হন ডিরোজিও। তাঁকে কলেজ থেকে বরখাস্তও করা হয়। কিন্তু তাতেও তিনি

দমে যাননি। ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যরা মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে সত্য গ্রহণের পক্ষে যে আন্দোলনের সূচনা করেন তার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধত্বকে সজোরে আঘাত করে জ্ঞান জগতে নতুন এক জাগরণের সূচনা হয়েছিল এসব মানুষের হাত ধরে। তরুণদের হাতে গড়ে ওঠা ও পরিচালিত এই ঘটনা ইতিহাসে 'ইয়াং বেঙ্গল' আন্দোলন নামে পরিচিত। এ বিষয়েও তোমরা পরবর্তী শ্রেণিতে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে।

বাংলা ভাগ ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতার পথে বাংলাদেশ

উপমহাদেশের মানুষ জ্ঞান চর্চায় যতবেশি সচেতন হচ্ছিল, ইংরেজবিরোধী আন্দোলনও তত প্রবল হচ্ছিল। মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার চর্চা এবং ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবেসে তাদের সামগ্রিক মুক্তির জন্যে তখনো কোনো একক গ্রহণযোগ্য নেতাকে বাংলা ভূখণ্ডে দেখা যায়নি। ২০ শতকের প্রথম ভাগে তেমনই একজন নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। তিনি বাংলার মানুষের মুক্তির জন্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করেন। ক্ষমতায় তখন অধিষ্ঠিত ব্রিটিশ শক্তি এবং ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগসহ অন্যান্য দল। ধর্মকে ব্যবহার করে ব্রিটিশ, ভারতীয় এবং বাঙালি অভিজাত রাজনীতিবিদদের রাজনীতি তখন তুঙ্গে। এরই মধ্যে যুক্ত বাংলা বা অবিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও চলছিল। ১৯০৫ এবং ১৯৪৭ সালে দুইবার বাংলা ভাগ করা হয় যা 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত। ১৯৪৭ সালে বাংলার পূর্ব অংশকে জুড়ে দেওয়া হয় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সংগে ধর্মের দোহাই দিয়ে এবং পূর্ব অংশে মুসলমান বেশি এই যুক্তিতে। অথচ ১৯৩১ এবং ১৯৪১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে তখনও প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি মানুষ ছিল ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম-সাংস্কৃতিক রীতি-নীতিতে বিশ্বাসী। তরুণ বঙ্গবন্ধু এ সময় মুসলিম লীগের রাজনীতি ধারণ করলেও তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং সকল মানুষের নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। বাংলা অঞ্চলকে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করে এর পূর্ব অংশকে পাকিস্তানের সাথে জুড়ে দেবার রাজনীতি সমর্থন করলেও বঙ্গবন্ধু কখন মানুষের মধ্যে ধর্মের নামে বিভেদ চাইতেন না। সকল মানুষের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসাই ছিল তাঁর কাছে প্রথম ও শেষ কথা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, একে ফজলুল হক এবং মাওলানা ভাসানীর মতো রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য আন্দোলন করে গেছেন। বাংলার পূর্ব অংশের সাধারণ মানুষের ওপর পাকিস্তানের মুসলমান শাসকদের শোষণ ও আধিপত্য তিনি মেনে নেননি।

ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধু মানুষের মুক্তির আন্দোলন করেছেন। শোষণ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে বারবার জেল খেটেছেন, সাধারণ মানুষকে পাকিস্তানি শাসকদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জীবন বাজি রেখে কাজ করেছেন। বাংলা অঞ্চলের মাটি-কাদা-পানির বাস্তবতা এবং জন মানুষের মধ্য থেকে উঠে আসা একজন মানবতাবাদী নেতা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু জানতেন, এই অঞ্চলের মানুষকে উন্নততর ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির নামে বহু দূরদেশ থেকে আগত উচ্চাভিলাষী তথাকথিত অভিজাত শ্রেণি হাজার বছর ধরে শাসন ও শোষণ করে চলেছে। কখন ধর্মের নামে, রাজবংশের নামে, সম্পদ দখল করার অভিপ্রায়ে, ক্ষমতার মসনদ পাওয়ার লোভে চলেছে এই শোষণ। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মধ্যে যারা ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ধর্ম, বংশ, জাত, নির্বিশেষে সকল পরিচয়ের বিভেদ পেছনে ফেলে কেবল মানুষ পরিচয়কে সামনে রেখে যে

ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রমাণ বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন ইতিহাসে তা দৃষ্টান্তমূলক। তাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম ও ত্যাগের পথ পেরিয়ে ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ঘটে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা। প্রতিটি শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও সংগ্রাম বিষয়ে তোমরা আরো গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য জানতে পারবে।

হাজার বছরের ইতিহাসে তোমরা দেখেছ, এই অঞ্চলের মানুষ কত বিচিত্র ধরনের বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। কখন প্রাকৃতিক আবার কখন মনুষ্য-সৃষ্ট প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে গেছে। বাংলা ভূ-খণ্ডের মানুষ বরাবরই শান্তিপ্রিয়, অসাম্প্রদায়িক। সবাই মিলেমিশে এবং বিপদে-আপদে পাশে থেকে বাস করার প্রবণতাই বাংলার ইতিহাসের চালিকাশক্তি। ভৌগোলিক বৈচিত্র্য মানুষের আচার-আচরণে, খাদ্যাভাসে, চিন্তা-চেতনায়, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে স্বকীয়তা তৈরি করেছে। পানির প্রচুরতা ও বৃষ্টি, সেচ ও কৃষিকে একদিকে যেমন করেছে সহজ, তেমনি আবার করেছে কঠিন। অঞ্চলটি খাদ্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ থাকায় দূর-দূরান্তের ভূ-খণ্ড থেকে আগত মানুষ এখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল। এখানকার আদি অধিবাসীদের সংগে তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েছে। আবার হয়েছে ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়। বাংলা তথা ভারতের ভৌগোলিক ভূ-খণ্ডের বহু দূরবর্তী স্থান হতে আগত ক্ষমতালোভী অনেকেই এখানে রাজক্ষমতা সম্প্রসারনণের চেষ্টা করেছে। উচ্চাভিলাষী অভিজাত শ্রেণি নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এতদঞ্চলের সাধারণ মানুষ, যারা ঐক্যবদ্ধভাবে কতিপয় তথাকথিত এলিট স্বার্থান্বেষী রাজশক্তিকে পরাজিত করে নিজেদের শাসনক্ষমতা আদায় করতে পারেননি। বাংলা অঞ্চল বরাবরই শাসিত হয়েছে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে থেকে আগত শাসকবর্গের হাতে। হাজার বছরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম বাংলার কাদামাটি, নদী আর সবুজ অরণ্য থেকে উঠে এসে সাধারণ মানুষের জন্যে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নির্মাণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' হিসেবে সবার কাছে স্বীকৃত। তবে তোমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি কেবল বাঙালির মুক্তির জন্যে লড়াই করেন নি, কোনো বিশেষ ধর্ম বা বর্ণ বা গোষ্ঠীর মানুষের জন্যেও লড়াই করেন নি। ধর্ম, বর্ণ, জাত, গোত্রের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে তিনি এই ভূমির সকল মানুষের জন্য, মানবতার ধর্মে আস্থা রেখে, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষকে সাথে নিয়ে তাদের মুক্তির আন্দোলন করেছেন। এজন্যেই 'বঙ্গবন্ধু'কে মানবতাবাদী এবং অসাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে 'বিশ্ববন্ধু' অভিধায়ও সম্মানিত করা হয়েছে। বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরি' পদকপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৩ সালের ২৩ মে পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল এই অভিধায় ভূষিত করেন।